জয়দেব

'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

"চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটকগীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রিদিনে
গান শুনে পরম আনন্দ।"

ষোড়শ শতকের হিন্দী কবি নাভাজী দাস তার 'ভক্তমাল' গ্রন্থে জয়দেবের স্তুতি করতে গিয়ে বলেছেন—"জয়দেব কবি হলেন রাজচক্রবর্তী, অন্যসব কবিরা খণ্ডমণ্ডলেশ্বর (ক্ষুদ্র গোস্বামী)। ত্রিলোকের এই 'গীতগোবিন্দ' সংস্কৃত সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।" এই কথাটি ভক্তিনত চিত্তের উচ্ছ্বাস বলে মনে হতে পারে। কিন্তু 'গীতগোবিন্দ' রচিত হওয়ার আটশো বৎসর পর 'গীতগোবিন্দ' গ্রন্থটি এখনও উজ্জ্বলতম ব্যতিক্রম। একটি কাব্যের দ্বারা বাঙালি সংস্কৃত সাহিত্যে সারস্বত সমাজে বিশেষ গৌরব লাভ করেছে। প্রেমের এক দৈবীরূপ সার্থক রূপ লাভ করেছে 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে। 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের বিষয় রাধাকৃষ্ণের বসন্তরাস। এই কাব্যের নায়ক-নায়িকা বা সখীর উত্তর-প্রত্যুত্তর ছলে নাটগীতের ধরনে রচিত। গ্রন্থটি সঙ্গীত প্রধান। কাব্যের অমূল্য সম্পদ এই গান তা গীতিকবিতার মতো হৃদয়ভাবের প্রকাশে ঝঙ্কৃত।

জয়দেব সংস্কৃত সাহিত্যে শেষ বাঙালি কবি যার দ্বারা বাঙলা সাহিত্য বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের কবি হয়েও বাঙালির হৃদয়ে তার আসন তৈরী করে নিতে পেরেছেন। কারণ তার কাব্যের ভাব ও ভাষা একান্তভাবে বাংলা ও বাঙালির। তাই বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য তাকে ভুলতে পারেনি, পারবেও না। বাংলা ভাষা সৃষ্টির পূর্ব মুহূর্তে জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর ভাষা বাংলা ভাষার উদ্ভবের প্রেক্ষাপট প্রস্তুত করে গিয়েছে। তার ভাষার মাধুর্য, ভাবের চিরন্তনত্ব এবং সর্বোপরি রাধাকৃষ্ণকে নিয়ে রচিত পদাবলী বাংলা সাহিত্যের কাছে বিশেষ পাথেয় স্বরূপ। সে কারণে জয়দেবকে বাংলা ভাষা ও বাঙালি আপন করে নিয়েছে ও বাংলা সাহিত্যের কবিরা জয়দেবকে তাদের নিজ সাহিত্যের মধ্যে স্বীকৃতি দিয়েছে।

জয়দেবের জীবনকথা ও জন্মস্থান ঃ

জয়দেবের জীবনবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বহুলোকশ্রুতি প্রচলিত থাকলেও সুদৃঢ় প্রমাণের উপর ভিত্তি করে কোন বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় নি। চক্রদত্ত প্রণীত সংস্কৃত ভক্তমাল, নাভাজীর হিন্দী ভক্তমাল এবং বীরভূমের বনমালী দাসের জয়দেব চরিত্রে এই জাতীয় বহু উপকথা সংগৃহীত হয়েছে।

জয়দেব লক্ষ্মণ সেনের পঞ্চরত্নের অন্যতম ছিলেন। অজয় নদের তীরে বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে তাঁর জন্ম। জয়দেবের পিতা ভোজদেব, মাতা বামাদেবী (মতান্তরে রাধাদেবী), পত্নী পদ্মাবতী। ভক্তমাল এবং বাংলায় প্রচলিত অন্যান্য জীবনী মতে পদ্মাবতী

Scanned with CamScanner

পুরীধামে জগন্নাথ মন্দিরে নৃত্য করতেন এবং জয়দেব বোধহয় নৃত্য-গীতের তালরক্ষা করতেন; তাই 'গীতগোবিন্দে' কবি সংক্ষেপে আত্মপরিচয় দিয়েছেন, 'পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্তী।' কেউ কেউ পদ্মাবতীকে জগন্নাথ মন্দিরের দেবদাসী বলতে চান। বৈষ্ণব গোস্বামী ও মধ্যযুগীয় সাধক-সন্তদের কৃপায় ভারতের প্রায় সর্বত্র জয়দেব সম্বন্ধে নানা গল্প কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। ফলে জয়দেবকে বাংলাদেশের, বীরভূমের, উড়িষ্যার, মিথিলার বলে প্রত্যেকে দাবী করেছেন।

জয়দেব—বাঙালি না ওড়িয়া ঃ

সম্প্রতি কবি জয়দেবের জন্মস্থান সম্পর্কে ওড়িয়া পণ্ডিত ও গবেষকগণ সিদ্ধান্তে এসেছেন—জয়দেব বাঙালি নন, তাঁর জন্মভূমি বলে পরিচিত কেন্দুবিল্ব গ্রাম পুরী জেলায় অবস্থিত। সুতরাং বাঙালিরা জয়দেবকে যে নিজেদের বলে দাবী করেন তার পিছনে কোন ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা নেই। ওড়িশার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও প্রত্নতাত্ত্বিক হরেকৃষ্ণ মহাপাত্র জয়দেবকে ষোল আনা ওড়িয়া কবিরূপে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এই অভিমত মানতে পারেন নি।

জয়দেব যে গৌড়ীয় কবি ছিলেন—সে কথা মনোমোহন চক্রবর্তী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর প্রকাশিত এক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। ড. কৃষ্ণমাচারিয়া তাঁর 'History of Classical Sanskrit Literature' গ্রন্থেও জয়দেবকে বাঙালি ও লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি বলেছিলেন। সনাতন গোস্বামীকৃত ভাগবতের টীকায় ('বৈষ্ণব তোষণী') মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী উমাপতি ধরের সঙ্গে জয়দেবের নামও উল্লিখিত হয়েছে। গীতগোবিন্দের একটি প্রাচীন ও প্রামাণিক পুঁথির পুস্তিকায় জর্জ বুলার দেখেছেন যে, লক্ষ্মণ সেন জয়দেবকে 'কবিরাজ' উপাধি দিয়েছেন। অন্যদিকে 'সেক্‌শুভোদয়া' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, সেখানে একজন মুসলমান লেখক জয়দেবকে লক্ষ্মণ সেনের সভাসদরূপে চিহ্নিত করেছেন।

শোনা যায় যে, অন্ধ হোমারকেও ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হত। তার মৃত্যুর পর গ্রীসের সাতটি শহর তাকে দাবী করেছিল, ঠিক তেমনি জয়দেবকেও একাধিক অঞ্চলের বলে দাবী করা হচ্ছে।

জয়দেব সমস্যা ঃ

জয়দেব এক বা একাধিক—এই নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছে। এক জয়দেব সংস্কৃত ছন্দের উপর গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি আলংকারিক অভিনবগুপ্ত তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন। আর এক জয়দেব 'প্রসন্ন রাঘব' নাটকের রচনাকার। ১৭৪৬ সালে একখানি সংস্কৃত পুঁথিতে আছে—জয়দেব গৌড়ের কেন্দুবিল্বে জন্মগ্রহণ করেন। জীব গোস্বামী তাঁর জন্মস্থান কেন্দুবিল্বকে জয়দেবের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত করেছেন। পণ্ডিত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বগুড়াতে (বাংলাদেশ) আর এক জয়দেবের জন্মস্থান বলে চিহ্নিত করেছেন। অনেকদিন আগে সেখানে জয়দেবের মেলা বসত ইত্যাদি।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় (২৪শে মার্চ, ১৯৯২) প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেছেন—যুক্তির পথে হাঁটলে জয়দেবকে বাঙালি বলেই গ্রহণ করতে হবে। আটশো

Scanned with CamScanner

বছর ধরে বাঙালি সেকথা স্মরণে রেখেছে। গৌড়ে মুসলমান অভিযানের পর সম্ভবত জয়দেব পত্নী পদ্মাবতীসহ পুরীধামে প্রস্থান করেছিলেন। ওড়িশার সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁর প্রভাব সুগভীর।

জয়দেব ও বাংলা সাহিত্য ঃ

জয়দেব সংস্কৃত ভাষার কবি—দেব-ভাষার সর্বভারত স্বীকৃত অভিজাত কবি। উত্তর-চৈতন্য কবি ও দার্শনিক গোষ্ঠীর ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য বাঙালির অন্তরঙ্গ মনোলোকে তাঁর চিরকালীন প্রতিষ্ঠা ঘটেছে এবং শেষপর্যন্ত কবি জয়দেবের কবিখ্যাতিকে আচ্ছন্ন করে তাঁর উপর ভক্তের গৌরব আরোপিত হয়েছে। চৈতন্যদেব 'শ্রীগীতগোবিন্দ' দিবারাত্রি আস্বাদন করতেন। সহজিয়া মতের বৈষ্ণবগণ তাঁকে 'অভিনব জয়দেব' উপাধি ধারণ করে শ্লাঘা অনুভব করতেন। প্রধানত প্রেম-বিহ্বল মহাপ্রভুর আস্বাদন-মাহাত্ম্যের প্রভাবেই চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির বাংলা মৈথিল ও অবহট্‌ঠ ভাষার রাধাকৃষ্ণ প্রেম পদাবলীর সঙ্গে জয়দেবের সমবিষয়ক সংস্কৃত কবিতাগুচ্ছ ও বৈষ্ণবপদ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নবীন প্রাণজাগরণের কেন্দ্রশক্তি ছিলেন মহাপ্রভু চৈতন্যদেব। তাছাড়া পুরাতন বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বাঙালির শ্রদ্ধা ও কৌতূহলও প্রথমে জাগ্রত হয়েছিল বিশেষভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-চেতনার ঐতিহ্য-ভক্তিকেই কেন্দ্র করে। ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য এবং বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের ইতিহাস প্রায় অভিন্নার্থক হয়ে পড়েছিল। জয়দেবের 'শ্রীগীতগোবিন্দ' পদাবলী বৈষ্ণব পদসাহিত্যের অচ্ছেদ্য শোভা সম্পদ; তাই প্রধানত বৈষ্ণব পদাবলীর শিরোভূষণ হিসেবেই বাংলা পদাবলী তথা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে জয়দেব-কবির প্রথম প্রত্যক্ষ প্রবেশ। কিন্তু সংশয়ান্বিত এই প্রত্যক্ষ প্রেরণাভূমিকে অতিক্রম করে বাংলা সাহিত্যের ভাবরূপের গভীরতর অন্তর্লোকে জয়দেবীয় ঐতিহ্য পরোক্ষে অনুপ্রবেশ করেছিল। বস্তুত বাংলা সাহিত্যের সেই বৃহত্তম প্রেক্ষাভূমিতেই তার সার্থক প্রতিষ্ঠা।

গভীরতর ভাব স্বরূপের সন্ধান ছেড়ে দিয়ে কেবল বাহ্য রূপশৈলীর বিচার করলেও দেখা যাবে, এমন কি জয়দেবের ভাষাভঙ্গী পর্যন্ত সংস্কৃত ব্যাকরণ অলংকার শাস্ত্রের অনুসারী হলেও অন্তরঙ্গে বাংলা ভাষার শৈলীর সম-স্বভাবিত। সংস্কৃত ছন্দে রচিত বর্ণনামূলক শ্লোকগুলি বাদ দিলে যে রাগমূলক পদাবলী গীতগোবিন্দের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, সেগুলি নামমাত্র সংস্কৃত ভাষা ছন্দে রচিত হলেও, এই ভাষা ও ছন্দের ভঙ্গী যতটা প্রাকৃত বা দেশী ভাষা ও ছন্দের অনুযায়ী, ততটা সংস্কৃতের নয়। আর 'গীতগোবিন্দে'র গীতাংশই আসলে 'মধুর কান্ত পদাবলী।' ভাষাগত বিচারে জয়দেব পদাবলী যে পরিমাণে সংস্কৃত, তার চেয়ে বেশী পরিমাণে সদ্যোজাত বাংলা ভাষা সাহিত্যের স্বাধর্মবিশিষ্ট। এই উপলক্ষ্যে মনে রাখা উচিত, চর্যাপদাবলীতেও বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র স্বভাব স্বচ্ছতা লাভ করতে পারেনি। সময়ের বিচারে চর্যার কিছু পদের তুলনায় গীতগোবিন্দ অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের রচনা। এদিক থেকে গীতগোবিন্দের রূপাঙ্গিকে বাংলা কাব্যরূপের পূর্ব-সম্ভাবনা চর্যাগীতির থেকে ব্যক্ততর হয়েছে বলে মনে করার কারণ আছে। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের ভাষা ও ভাবগত

Scanned with CamScanner

নিঃসংশয় প্রতিনিধি 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পূর্বচ্ছায়া গীতগোবিন্দের দেহে অস্ফুট লাবণ্যের মতোই অঙ্কুরিত হয়েছিল।

সংস্কৃত কবিতার ছন্দ-প্রকৃতি সম্বন্ধে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, কোন সুনিশ্চিত বাধানিষেধ না থাকলেও, এই ছন্দ-শৈলীর পক্ষে অন্ত্যমিল বা rhyme-এর প্রয়োগ স্বাভাবিক নয়। অন্যপক্ষে অপভ্রংশ ছন্দের স্বভাব-বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই অন্ত্যমিল। পরবর্তীকালে বাংলাভাষার নিজস্ব পয়ারাদি ছন্দ প্রকরণে অন্ত্যমিল আবশ্যিক বলে বিবেচিত হয়েছিল। বিশুদ্ধ সংস্কৃত ছন্দে লেখা গীতগোবিন্দের বর্ণনামূলক শ্লোকগুলিতে শুধু অন্ত্যমিলই যে অনুপস্থিত তা নয়, শব্দ প্রয়োগের বিশিষ্ট প্রবণতার দিক থেকেও ঐসব শ্লোক সংস্কৃত ভাষার বিশেষ চরিত্রের অনুবর্তন করেছে।

যেমন— বিহরতি বনে রাধা সাধারণ প্রণয়ে হরৌ
বিগলিত নিজ্যোৎকর্ষাদীর্ষাবশেন গতান্যতঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জে গুঞ্জন্ম ধ্রুবত মণ্ডলী—
মুখ শিখরে লীনা দীনাপ্যুবাচ রহঃ সখীম্।।

এরই পাশে কাব্যের গীতাংশ থেকে একটি পদ হল—

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।।

শুধু শব্দের প্রয়োগগত বিভিন্নতাই নয়, উদ্ধৃত দুটি শ্লোকের মধ্যে ছন্দ প্রকৃতির মূলগত পার্থক্যও অনায়াসে অনুভূত হয়। গীতগোবিন্দের গীতাবলীর ছন্দ মাত্রাপ্রধান হলেও তা প্রাকৃত অপভ্রংশের স্বভাব যুক্ত, সংস্কৃতের সঙ্গে তার পার্থক্য আমূল। এই পদাবলীর বহুস্থানে অপভ্রংশ ষোলমাত্রিক পাদাকুলক ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—

বি হ র তি। হ রি হ র। স র স ব—। সন্ তে
৪ + ৪ + ৪ + ৪ = ১৬

ওপরের চরণটি আসলে চৌদ্দ অক্ষরের সমষ্টি ; শেষপদের দুটি অক্ষরকেই দীর্ঘ মাত্রাযুক্ত করে ষোল মাত্রা রচনা করা হয়েছে। উচ্চারণগত শিথিলতার ফলে এই ষোল মাত্রা অনায়াসে চৌদ্দ অক্ষরে পর্যবসিত হতে পারে আর অনুরূপ সম্ভাবনার পরিণতিতেই ক্রমশ ষোল মাত্রার পাদাকুলকের পরিবর্তে বাংলা ভাষার চৌদ্দ অক্ষরের পয়ার গড়ে উঠেছে। সেইসঙ্গে অন্ত্যমিল পয়ার ধর্মকে আরও নিবিষ্ট করেছে। তাছাড়া বাংলা ত্রিপদীর সুরও গীতগোবিন্দে কোথাও কোথাও অস্পষ্টাকারে পাওয়া যায়। পূর্বোদ্ধৃত 'পততি পতত্রে' ইত্যাদি পদটিকে সহজেই ত্রিপদীর আকার দেওয়া যায়—

পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে
শঙ্কিত ভবদুপযানম্।

তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের অর্থবিন্যাসের দিক থেকেও জয়দেব পদাবলী যে বাংলাধর্মী, শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সে কথা ব্যক্ত করেছেন ঃ "সংস্কৃত কবিতা সাধারণত পদ চতুষ্টয় সমন্বিত এক একটি stanza-য় পর্যবসিত; এবং এইরূপ শ্লোকের সমষ্টি লইয়াই কাব্য।

Scanned with CamScanner

শ্লোকগুলি কখনো সম্বন্ধ, কখনো অসম্বন্ধ; কিন্তু এক-একটি শ্লোক প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবের জ্ঞাপক। পদাবলীর প্রকৃতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এগুলিকে ব্যষ্টিভাবে লইলে সম্পূর্ণ অর্থ গ্রহণ করা যায় না। গানের মতো পৃথক রূপে বিভিন্ন ভাবের প্রকাশক হইলেও এগুলিকে সমষ্টিভাবেই ধরিতে হইবে এবং অন্তে নিবিষ্ট refrain বা ধ্রুবপদই ইহার ভাব পরম্পরার যোগসূত্র। পদাবলীর এই ধারণাটি দেশীয় গানের প্রথাই অবলম্বন করিয়াছে।" পরবর্তীকালে বৈষ্ণব পদাবলীর মধ্যেও জয়দেব-পদাবলীর এই স্বভাব-বৈশিষ্ট্যই অনুসৃত হয়েছে।

গীতগোবিন্দের কাহিনী-সংস্থাপনে নাট্যলক্ষণটুকুও লক্ষ করার মতো। অধিকাংশ ভাগই কৃষ্ণ ও সখীর সংলাপ-মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে; মাঝে মাঝে বর্ণনামূলক শ্লোকের দ্বারা সেই সংলাপমূলক ঘটনাবলীকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই কলাকৃতিই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো বাংলা "গীতিনাট্য শ্রেণীর গীতিকাব্য"তে পরবর্তীকালে অনুসৃত হতে দেখি। এদিক থেকে গীতগোবিন্দের রূপাঙ্গিকের মধ্যে বাংলার নিজস্ব নাট্যস্বভাবের প্রথম ঐতিহাসিক পরিচয় নিবদ্ধ হয়েছে। এই রূপ-প্রকৃতির কাঠামো পরবর্তীকালের সংলাপমূলক বাংলা কাব্য-কবিতায় অনুসৃত যে হয়েছিল, এ তথ্য অনস্বীকার্য।

ধোয়ী, শরণ, গোবর্ধন, উমাপতি ধর—এঁরা কালিদাস ইত্যাদির অনুসরণ করে যে কালে মৃতপ্রায় ভাষায় প্রাচীন ভাবের উদ্বর্তন মাত্র করেছিলেন, জয়দেব তখন নূতন এক জীবনাকৃতিকে নবীন ভাবে ও ভাষায় প্রথম গতি ও মুক্তি দিয়েছেন। এই প্রচেষ্টায় বাংলার সমকালীন ধর্মকথাশ্রিত সাহিত্য রচনার ধারায় তিনি সর্বজনীন রূপসৃষ্টির যে ঐতিহ্য রচনা করলেন, তাও লক্ষ করার মতো। গীতগোবিন্দের সৃজন-প্রেরণার মূলে উদ্দেশ্যের যে বিমিশ্রতা ছিল, স্বয়ং কবি সে তথ্য স্বীকার করেছেন—কেবল 'হরিস্মরণে' মনকে সরস করাই তাঁর একমাত্র আকাঙ্ক্ষা নয়, 'গীতগোবিন্দ'র সাহিত্যিক ফলশ্রুতি 'বিলাস-কলা-কুতূহল' চরিতার্থ করার মানব রস-বাসনার গভীরে। জয়দেবের কাব্য রাধাকৃষ্ণ কথাশ্রিত এক উজ্জ্বল রসদীপ্ত সাহিত্য-কীর্তি, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের রাধাতত্ত্ব-চেতনার সংগঠনের উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল,—চৈতন্যোত্তর বাংলা বৈষ্ণব কবিতাবলীতে সেই ধর্মভাবনার ছাপও দুরান্বিত নয়। সেদিক থেকেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গীতগোবিন্দের সাহিত্যকীর্তি অবিস্মরণীয়।

অন্যপক্ষে, অভিজাত-অনভিজাত এই দুই সমান্তরাল ধারায় বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঙালি সংস্কৃতির যে ঐতিহ্য পরিচয় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার মাধ্যমে পৃথক পৃথক ভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল, তাকেই একত্র সংবদ্ধ করে নবজন্ম নিয়েছিল বাংলা ভাষার সাহিত্য। চর্যাপদে সেই মিলনের একটি রূপ আভাসিত হয়েছে, গীতগোবিন্দে সেই প্রচেষ্টারই স্পষ্টতর সাক্ষর। মধ্যযুগে আর্য-ব্রাহ্মণ্য এবং ব্রাহ্মণ্যোত্তর ঐতিহ্যকে একত্র আত্মসাৎ করেই নতুন ভাবরূপে আবির্ভূত হয়েছিল বাঙালির সাহিত্য, সেই সংস্কৃতি-সমন্বয়ের বাস্তব জীবনমূর্তি হিসেবেই চৈতন্যদেব কেবল বৈষ্ণব ধর্ম সাহিত্যেরই নয়, মধ্যযুগের বাঙালি জীবন ও বাংলা সাহিত্যেরও একক ও অনন্য পথস্রষ্টা। চৈতন্যদেবে যে জীবনবোধের চূড়ান্ত পরিণতি, জয়দেবে তারই প্রথম অঙ্কুরোদ্গম। এই কারণেই জয়দেব চৈতন্যদেবের কাছে পূর্বাচার্যের মর্যাদা পেয়েছিলেন। আর চৈতন্যের হাতে বাংলা সাহিত্যপথের যে মুক্তি, গীতগোবিন্দ-পদাবলীতে তার পূর্বসূচনা বলেই, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পথের প্রথম একক উল্লেখ্য নির্মাতা কবি জয়দেব

Scanned with CamScanner

গীতগোবিন্দ কাব্যের বিষয় ও বৈশিষ্ট্য ঃ

গীতগোবিন্দের বিষয় রাধাকৃষ্ণের বসন্তরাস। গীতগোবিন্দ কাব্য দ্বাদশ সর্গে রচিত। কাব্যের প্রথমে মঙ্গলাচরণের শ্লোক, তারপর কবি পরিচিতি, হরিস্মরণ, কবি প্রশস্তি ও বিখ্যাত দশাবতার স্তোত্র স্থান পেয়েছে। মূলকাব্যের আরম্ভ অপূর্ব বসন্ত দিয়ে। সখী এসে রাধার বিরহ অবস্থা বর্ণনা করলেন—ললিত লবঙ্গ লতা পরিশীলন কোমল মলয়সমীরে। মধুকর নিরকরম্বিত কোকিলকূজিত কুঞ্জকুটীরে। বিহরতি হরিরিহ সরস বসন্তে। নৃত্যতি যুবতিজনেন সমং সখি বিরহিজনস্যদুরন্তে।' কৃষ্ণের বিরহদশা বর্ণনা করলেন এবং আরও বললেন 'রতি সুখসারে গতমভিসারে মদন মনোহরবেশম্।' মিলনে উৎকণ্ঠিতা হলেও রাধা বিরহে শক্তিহীনা, সে খবর সখী গিয়ে কৃষ্ণকে দিলেন। এদিকে রাধা বাসকসজ্জিকা অবস্থায় প্রলাপ বকছেন। সেই বিলাপ করুণ ও মর্মস্পর্শী। প্রভাতে কৃষ্ণ এলেন তখন মদনানলে জর্জরিতা খণ্ডিত রাধার মানিনী অবস্থা। সখীরা উপদেশ দেন। কৃষ্ণ রাধার মানভঞ্জনের প্রয়াস করেন—

"স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনম্
দেহি পদপল্লব মুদারম।"

এরপর সখীর অনুরোধে কলহান্তরিতা রাধার কুঞ্জ গৃহে গমন। কৃষ্ণের তখন চন্দ্র দর্শনে তুঙ্গ তরঙ্গের জল নিধির মতো অবস্থা। রাধারও প্রিয়তম দর্শনে স্বেদাক্ত সহর্ষভাব। এই অবস্থায় লজ্জা, লজ্জা পেয়ে দূরে অন্তর্হিত হল (সলজ্জা লজ্জাপি ব্যগমদতিদূরং মৃগদৃশঃ)। দ্বাদশ সর্গে সুপ্রীত পীতাম্বরের সঙ্গে রাধার মিলন। রতি বিলাস ও বিলাসান্তে 'পত্রলেখা' রচনা এবং প্রার্থনার মাধ্যমে কাব্যের পরিসমাপ্তি। এই কাব্যের দ্বাদশ সর্গ। বারোটি সর্গ হল সামোদ দামোদর, অক্লেশকেশব, মুগ্ধ মধুসূদন, স্নিগ্ধ মধুসূদন, সাকাঙ্ক্ষ পুণ্ডরীকাক্ষ, ধৃষ্ট বৈকুণ্ঠ, নাগর নারায়ণ, বিলক্ষলক্ষীপতি, মুগ্ধ মুকুন্দ, মুগ্ধ মাধব, সানন্দ গোবিন্দ এবং সুপ্রীত পীতাম্বর।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ **নাট-গীতের** আকারে লেখা। তবে গীতগোবিন্দের গানগুলি অপরিহার্য ও মর্মস্পর্শী—নাট্যধর্ম তুলনায় গৌণ। উক্তি প্রত্যুক্তি গীতের আকারেই পরিবেশিত। পাত্রপাত্রী মাত্র তিনটি—সখী, কৃষ্ণ ও রাধা। এই কাব্য সঙ্গীত প্রধান। কাব্যের অমূল্য সম্পদ এই গান। তা গীতিকবিতার মতো হৃদয়ভাবের প্রকাশে ঝঙ্কৃত।

জয়দেব গীতগোবিন্দ ছাড়া কয়েকটি পদ লিখেছিলেন। তার মূল্য কিছু নেই। এই পদগুলির অধিকাংশই 'যুদ্ধ', বীররস, লক্ষ্মণসেনের স্তুতি এবং আদি রসের বর্ণনা।

জয়দেবের কাব্য অতি মধুর। ভাষা সুললিত, পরিমার্জিত ও শ্রুতি সুখকর। এর রস শৃঙ্গার রস। এই কাব্যে মানব প্রেমের দেবায়ন সুপ্রতিষ্ঠিত। লৌকিক বৈভব এখানে রাধা কৃষ্ণে পরিণত। লৌকিক প্রেমানুভব এখানে দেব শৃঙ্গারানুভবে রূপান্তরিত। জয়দেব স্পষ্ট করে বলেছেন—'এই কাব্য হরির বিলাস বর্ণনা। এই কাব্য বর্ণনা করলে হৃদয় সরস হয়।'

Scanned with CamScanner

পরিপূর্ণ প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি ছিলেন জয়দেব। তিনি অপার্থিবকে পার্থিব রূপ ও রসের সীমানায় লাভ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। কবি জয়দেব তাঁর আত্মগত ভাবনার দ্বারা রূপ ও রসের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের অপূর্ব এক যুগলমূর্তি রচনা করেছেন। তিনিই প্রথম রাধাপ্রেমকে কাহিনীর অখণ্ডতায় নায়িকার পূর্ণ মর্যাদা দান করেন।

এই কাব্য থেকে বৈষ্ণব ধর্মের রাধার সুপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসটি অবগত হওয়া যায়। পূর্ববর্তী প্রেমকাব্যে রাধা সাধারণ নায়িকা। 'গীতগোবিন্দে'র রাধা 'সংসার বাসনা বন্ধ শৃঙ্খলা'। লোকজগতের নায়িকা এখানে প্রায় 'মহাভাব ময়ীরূপে চিত্রিতা। জয়দেবে এসে যে প্রেম ধারার প্রবল উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয়েছে, সেই ধারাই প্রভাবিত হয়েছে বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীতে। প্রেমকবিতার বিবর্তনের ইতিহাসে জয়দেব একটি সীমাচিহ্ন।

গীতগোবিন্দ **মিলনান্তক**। বিরহী রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনা দিয়ে এ কাব্য পরিসমাপ্ত। পার্থিব কামনা বাসনার কথা থাকলেও গীতগোবিন্দ **ভক্তিমূলক কাব্য**—সর্ব ভারতে ভক্তিগীতিরূপেই এই কাব্যের প্রতিষ্ঠা। প্রতিটি সর্গে প্রতিটি গানের পরে কবি ভক্তশ্রোতার জন্য প্রার্থনা জানিয়েছেন—'হরি পাতু বঃ, বিতনোতু শুভানি।' জয়দেব ভক্তের শ্রবণ-মনন-স্মরণের জন্যই গীতগোবিন্দ রচনা করেছেন। যাঁরা মন্তব্য করেন, 'গীতগোবিন্দে গীত আছে, গোবিন্দ নাই'—তাঁরা ভুল বলেন। গীতগোবিন্দে গীতও আছে, গোবিন্দও আছে। তবে সে গোবিন্দ শঙ্খ-চক্রধারী কৃষ্ণ নন, তিনি বংশীধারী মধুর কৃষ্ণ। সে কৃষ্ণ 'মূর্তিমান শৃঙ্গার'। জয়দেব তাই ভক্তকবি। রাধা চরিত্রটি অলংকার শাস্ত্রসম্মত—তা পূর্ণাঙ্গ না হলেও আকর্ষণীয়। সখীরা এখানে রাধাকৃষ্ণ লীলা বিস্তারিকা।

জয়দেবের কাব্য সংস্কৃতে রচিত হলেও তার ভাবধর্ম একান্তভাবে **লৌকিক** প্রাণধর্মের অনুকূল। জয়দেব রাধাকৃষ্ণের প্রেমকাহিনীকে আধ্যাত্মিক রূপদানে প্রয়াসী হয়েছেন।

গীতগোবিন্দ-এর **ভাষা** বিচার করে প্রথমে লসেন ও পরে পিসেল সাহেব মন্তব্য করেছেন যে 'গীতগোবিন্দে'র পদগুলির ভাষা ছন্দ ও অন্ত্যানুপ্রাস-এর মধ্যে অপভ্রংশের স্পষ্ট প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। 'গীতগোবিন্দে'র ছন্দের মধ্যে যে অপভ্রংশের প্রবল প্রভাব রয়েছে তা অবশ্যই স্বীকার করতেই হয়। ঘটনার বর্ণনায় এবং কৃষ্ণ-রাধার ও সখীর উক্তি-প্রত্যুক্তিগুলি সংস্কৃত জাতি ছন্দে রচিত—

"পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপযানম্।
রচয়তি শয়নং সচকিত নয়নং পশ্যতি তব পন্থানম্।"

এই ছন্দের মধ্যে প্রাচীন বাংলার সুর অনুরণিত হয়।

'গীতগোবিন্দ' কোন **শ্রেণীর রচনা** এই নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন—

উইলিয়াম জোনস্—রাখালী নাটগীতি।

লসেন—গীতিনাট্য।

ভনশ্রোয়েভার—উন্নত ধরনের যাত্রা।

পিসেল—অপেরা (অতিনাটকীয় লক্ষণাক্রান্ত)।

এ. বি. কিথ গীতগোবিন্দের গোত্র নির্ণয় করতে গিয়ে লিখেছেন, "The poet divides

the poem into cantos, which is a clear sign that he recognized it to belong to the generic type Kāvya, and that he did not mean it to be a dramatic performance with the division into acts, interludes, and so forth."

এইসব কথা মনে রেখেও বলা যায় এই কাব্যে গান, নাটক, আখ্যান, গীতিকবিতা ও স্তোত্র প্রভৃতি প্রত্যেকেরই প্রভাব রয়েছে। তবে এর মধ্যে আখ্যান কাব্যের লক্ষণ বেশি থাকায় কাব্যটি বাহ্যত আখ্যানকেন্দ্রিক গীতিকাব্য রূপে বিবেচিত হয়। R. W. Frazer-এর মত এই প্রসঙ্গে আলোচ্য—"The poem of Jayadeva marks the gradual development in the twelfth century of the doctrine of Faith (bhakti), of emotion, and personal love towards a deity in human form."

অন্যান্য রচনা :

'সদুক্তিকর্ণামৃত'-এ জয়দেবের যে তেরটি পদ সংকলিত হয়েছে, তার মধ্যে এগারটি পদ 'গীতগোবিন্দ'-বহির্ভূত ভিন্ন ধরনের রচনা। এই পদগুলির অধিকাংশ রচনা যুদ্ধ, বীররস, লক্ষ্মণসেনের স্তুতি কিংবা দেহকেন্দ্রিক আদি রসকেন্দ্রিক। দুটি পদে মহাদেব ও কল্কি-র বর্ণনা আছে।

কেউ কেউ মনে করেন, জয়দেব সম্ভবত লক্ষ্মণসেনের দিগ্বিজয় বিষয়ে কোনো কাব্য রচনা করেছিলেন। সেই কাব্য থেকে সদুক্তিকর্ণামৃত-এ বীররসাত্মক শ্লোকগুলি গৃহীত হয়েছে। তবে তা অনুমান মাত্র।

বাংলা কাব্যসাহিত্যে জয়দেবের প্রভাব :

জয়দেবের প্রভাব অত্যাধুনিক কাল পর্যন্ত। অনতিক্রম্য ভাব, ভাষা, ছন্দের সার্থকতায় 'গীতগোবিন্দ' যেন পরবর্তী কালে স্তোত্র রূপে বিরাজমান। মনে রাখতে হবে, 'গীতগোবিন্দ'-এ আছে মানব-মানবীর প্রেম মিলনের ছবি, আছে বাস্তব ও নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং গীতিমাধুর্য, যার অন্তঃস্থলে ভক্তি রসের ধারা প্রবাহমান, আর রয়েছে কাব্যগন্ধী ভাষা ও ছন্দের কারুকার্য।

বাংলা সাহিত্যের আদি পর্ব থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত জয়দেবের প্রভাব অসাধারণ। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এর আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য বিচারে জয়দেবের প্রভাব যথেষ্ট। কাব্যের কায়া গঠনে, নাটকীয় উক্তি-প্রত্যুক্তিতে 'গীতগোবিন্দ'-এর মানবী এই কাব্যের নায়িকা ও মানবী রাধা। 'গীতগোবিন্দ'-এ রাধা, কৃষ্ণ ও সখী প্রধান চরিত্র। বড়ু চণ্ডীদাসেরও প্রধান চরিত্র রাধা, কৃষ্ণ ও বড়াই। উভয় কাব্যের কাব্যবস্তু ও ভাব সমপর্যায়ের। ছন্দের দিক দিয়ে 'গীতগোবিন্দ'-এর পাদাকুলক ছন্দ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ তাই পয়ার ছন্দ। সর্বোপরি 'গীতগোবিন্দ'-এর 'রতিসুখসারে'র সঙ্গে ভাবগত ও ছন্দগত সাদৃশ্যের পরিচয় বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যকে বাদ দিলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য ও পদাবলী সাহিত্যে জয়দেবের প্রভাব অপরিসীম। এই কাব্য থেকে বৈষ্ণব ধর্মে রাধার সুপ্রতিষ্ঠার ইতিহাসটি অবগত হওয়া যায়। পরবর্তী কালে প্রেমকাব্যে রাধা সাধারণ নায়িকা যার প্রভাব 'গীতগোবিন্দ'-এর রাধা থেকে। জয়দেবে প্রেমধারার যে প্রবল উচ্ছ্বাস কল্লোলিত হয়েছে সেই ধারাই প্রভাবিত হয়েছে বাংলার বৈষ্ণব পদাবলীতে। প্রেমকবিতার বিবর্তনের ইতিহাসে জয়দেবের আদর্শ বিশেষ ভাবে চিহ্নিত।

Scanned with CamScanner

সংস্কৃত দেবায়ত প্রেম কবিতায় অব্যবহিত সার্থক উত্তরাধিকারী বাংলার **বৈষ্ণব পদাবলী**। প্রেমের কবিতায় লৌকিক ভাবের স্বরূপ জয়দেবে এসে রাধা-কৃষ্ণের লীলা বর্ণনায় যেরূপে পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেই রূপেরই যথার্থ প্রকাশ ও বিকাশ দেখা যায় বাংলা বৈষ্ণব কবিতায়। বাংলায় বৈষ্ণব পদের গঙ্গোত্রী জয়দেব-বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব পদকর্তাগণ জয়দেবের কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। আকারে-প্রকারে ভাবে-ঝঙ্কারে অলংকারে রসের প্রকাশে ও আস্বাদনের লক্ষ্যে বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী জয়দেব গোস্বামীর মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর প্রতিরূপ। বিদ্যাপতি নিজেকে 'অভিনব জয়দেব' উপাধিতে ভূষিত করে গর্ব অনুভব করতেন। গীতিগোবিন্দ বৈষ্ণব পদাবলীর উৎস।

জয়দেবের লোকপ্রিয়তার প্রধান কারণ ছিল তাঁর **সুললিত ভাষা, ছন্দ**। গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে রচিত হলেও তাতে অপভ্রংশ, মৈথিলী প্রাচীন বাংলা প্রভৃতি ভাষা ও ছন্দের প্রভাব আছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে গীতগোবিন্দ বাঙালির প্রাণধর্ম ও ঐতিহ্যের সঙ্গে নিগূঢ় যোগসূত্র রচনা করে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত ও নির্দেশিত করেছে।

অপরদিকে মঙ্গলকাব্যের ধারায় বর্ণনাত্মক ছন্দরীতি এবং বিবৃতিময়তার মধ্যে জয়দেবের প্রভাব রয়েছে। ময়ূরভট্ট, মানিকরাম, কানা হরিদত্ত প্রভৃতি কবি 'গীতগোবিন্দ'-এর দ্বারা প্রভাবিত। নামকরণে, প্রকৃতি বর্ণনায়, ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা বর্ণনায় মধ্যযুগের কবিরা পদে পদে জয়দেবের দ্বারস্থ হয়েছেন।

আধুনিক যুগে মধুসূদন জয়দেবের সঙ্গে গোকুল ভবনে নব পরিক্রমা করেছেন—'চল যাই, জয়দেব গোকুল ভবনে।' বঙ্কিমচন্দ্র তার উপন্যাস সাহিত্যে নায়িকা চিত্রণে, প্রকৃতি বর্ণনায় জয়দেবের ভাষা পর্যন্ত ব্যবহার করেছেন। 'আনন্দমঠে' সত্যানন্দের ইঙ্গিতবহ গানের মধ্যেও জয়দেবের প্রভাব রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তার 'বিবিধ প্রবন্ধে' 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামে একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে হাঙ্গর শিকারের বর্ণনায় 'পশ্যতি তব পন্থানম্' শ্লোকটি ব্যবহার করেছেন জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' থেকে।

রবীন্দ্রনাথও বেশি করে জয়দেবের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনিও বর্ষামেদুর শ্যাম বঙ্গদেশে বসে কবি জয়দেবকে স্মরণ করেছেন—

"যেথা জয়দেব কবি কোন বর্ষাদিনে
দেখেছিলা দিগন্তের তমাল বিপিনে
শ্যামাচ্ছায়া পূর্ণ মেঘে মেদুর অম্বর।"

ছন্দের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ 'গীতগোবিন্দ'-এর প্রভাব এড়াতে পারেন নি। তাই জয়দেবকে বাদ দিয়ে কি প্রাচীন, কি আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কোন যুগের আলোচনাই পূর্ণ হতে পারে না। জয়দেব তাই বাংলা সাহিত্যের আদিগুরু। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায়—

'বাংলার রবি জয়দেব কবি কান্তকোমল পদে
করেছ সুরভি সংস্কৃতের কাঞ্চন-কোকনদে।।'

Scanned with CamScanner